ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

খেলাঘর: একটি সরল পর্যবেক্ষণ

*ড. নূর সালমা খাতুন

সারসংক্ষেপ: প্রথিতযশা কথাশিল্পী মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস *খেলাঘর*। পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ হলেও প্রায় সরলরৈখিক আখ্যানের এই ক্ষীণকায় উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয় মুক্তিযুদ্ধ একজন নারীর জীবনে যে ভয়াবহ ছায়া ফেলে সেটাই। মাহমুদুল হকের দেখার এবং দেখানোর ভঙ্গি দুটোই স্বতন্ত্র। তাই মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে লিখতে গিয়ে ইতিহাস বা রাজনীতির চর্চাকে উপক্ষো করে জীবনকে বেছে নিয়েছেন। উপন্যাসে একই সমান্তরালে গ্রামীণ জীবন তার সমগ্র স্নিগ্ধতা আর কোমলতাকে ধারণ করেছে এবং যুদ্ধের হিংস্রতা, তীব্রতা উত্তাপ ছড়িয়েছে ব্যক্তির জীবনে ও বোধে। রেহানা ওরফে ঝুমি ওরফে গাব্বু ওরফে টেঁপি ওরফে লতানাম্নী মেয়েটির কথার তুবড়ি মিঠুসারের আদিনাথের ভিটেয় প্রাণের সঞ্চার করেছে– আর মুক্তিযুদ্ধ তার হিংস্র থাবায় এই মেয়েটির থেকে প্রাণটুকু বের করে এনেছে। অসীম বেদনায় ভেঙে যাওয়া খেলাঘর ছেড়ে মেয়েটি চলে যায় হয়ত আরেক খেলাঘর গড়তে। যুদ্ধাক্রান্ত দেশ, যুদ্ধাক্রান্ত নারী, বিমর্ষ অনুভূতি, তীব্র মনোবেদনা আর লড়াইয়ের উত্তেজনা– একসূত্রে গাঁথা মাহমুদুল হকের *খেলাঘর* এর শরীর জুড়ে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) একটি বিশিষ্ট নাম। এই জনপদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি, সামাজিক জীবন ও আবহমান সংস্কৃতি-চেতনাকে অঙ্গীকৃত করে ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যে স্বাড়ম্বরে আত্মপ্রকাশ করেন মাহমুদুল হক। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত লেখকজীবনে কখনও স্বল্প কখনো দীর্ঘ বিরতি দিয়ে নিয়মিতভাবে লিখে যান তিনি। রম্যরচনা, ছড়া, কবিতা, সনেট, শিশুসাহিত্য রচনা করলেও নিবিড় মনোযোগ দেন গল্প আর উপন্যাস রচনায়। একটি কিশোর উপন্যাসসহ নয়টি উপন্যাসের স্রষ্টা মাহমুদুল হক।

তাঁর উপন্যাস নিছক কাহিনির উপস্থাপনা নয়, তিনি বেছে নেন চরিত্রের ভেতরের অন্তর্কথনকে অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক হৃদয়বৃত্তির উদ্ভাসন ঘটান লেখায়। জীবন সম্পর্কে মাহমুদুল হকের ঘোষণা, জীবন অনেক বিরাট ব্যাপার, বিশাল তার অবয়ব। কিন্তু একটা স্টেজে এসে প্রত্যেক মানুষই আবিষ্কার করে সে ব্যর্থ।[১] এরকম দার্শনিকবোধে সিক্ত মাহমুদুল হক মনে করেন জীবনের খণ্ডিত রিপুগুলো এসেছে তাঁর উপন্যাসে এবং জীবনের বড় ঢেউয়ের চেয়ে ছোট ঢেউগুলোকে তুলে ধরেছেন লেখায়।[২] এক নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে '৪৭-এর দেশবিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের জটিল জীবনকে রূপায়িত করেন মাহমুদুল হক। তিনি সমাজ-সময়-সমকাল-দেশ-রাজনীতি সবকিছুকেই লেখার বিষয়বস্তু করেন। এতে ভিন্নতা নেই বললেই চলে। তবে ভিন্নতা রয়েছে অন্যখানে—সেটা হলো দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জীবনকে দেখেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, গভীর অনুসন্ধানী মন নিয়ে। আর লেখায় ফুটিয়ে তোলেন ব্যক্তির মনোজগতের রহস্যময়তা, হৃদয়ের টানাপোড়েন, সমাজের অনেক অনভিপ্রেত সত্যকে। এই জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* (১৯৭২), *খেলাঘর* (১৯৭৮), *অশরীরী* (১৯৭৯) এই তিনটি উপন্যাসে আসে।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী

মাহমুদুল হক এর ষষ্ঠ উপন্যাস *খেলাঘর*। রচনাকাল ১৪-২০ আগস্ট ১৯৭৮। প্রথম প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত *সচিত্র সন্ধানী*র ১ম বর্ষ সংখ্যা ২০-এ। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য সমবায়, ঢাকা থেকে এপ্রিল ১৯৮৮-তে। মোট এগারো অধ্যায়ের আশি পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে প্রতিটি অধ্যায়ের কাহিনির সাথে সংগতি রেখে নামকরণ করা হয়। প্রায় সরলরৈখিক আখ্যানের এই ক্ষীণকায় উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা হলেও মুক্তিযুদ্ধ এখানে কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। বরং মুক্তিযুদ্ধ একজন নারীর জীবনে যে ভয়াবহ ছায়া ফেলে এটাই আখ্যানে প্রাধান্য পায়।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'কেয়াপাতার নৌকো'। রেহানা আর ইয়াকুবের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয়ভাবে আখ্যানের শুরু। আখ্যানের বিবরণদাতা উত্তমপুরুষ। প্রায় মাঝপথে গল্প শুরু হয়। অধ্যায়ের প্রথম শব্দটির প্রথম অক্ষর বড়ো করে লেখা। ভরা বর্ষায় নিজে নৌকার লগি ঠেলে একটি মেয়েকে মিঠুসার গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের কলেজের শিক্ষক ইয়াকুব। মেয়েটির অনেকগুলো নাম। যেমন : ঝুমি, আন্না, গাব্বু, টেঁপি, লতা। এছাড়া কথকের সম্বোধনে রেহানা নামটি পাওয়া যায়। এতগুলো নামের মতোই সে চঞ্চল, বেগবান, কথার তুবড়ি ছোটানো মিষ্টি হাসিখুশি ভরা প্রাণবন্ত। ইয়াকুব আর রেহানার নির্বিরোধ কথার মধ্যে অনেকটা প্রাসঙ্গিকভাবেই গ্রামীণ বর্ষা প্রকৃতির কথা আসে। আর এর ভেতর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার বিষয়টি উঠে আসে। ফলে আখ্যানে আরেকটি উত্তেজনা ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করে। এর সাথে আছে রেহানার ঘনঘন মন বা চিন্তার ক্ষেত্র বদলানোর কথা যা বর্ষা-প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সঙ্গে বেশ মানানসই। অধ্যায়ের নামকরণের সাথে ভেতরের ঘটনার পুরো সাদৃশ্য রয়েছে। তারা নৌকায় করে বিলের মাঝখানে মিঠুসার গ্রামের সবচেয়ে নির্জন দিকের একটি পরিত্যক্ত পোড়োবাড়িতে আসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'আদিনাথের ভিটে'। নামের সাথে সম্পৃক্ত রেখে এখানে মিঠুসারের একসময়ের প্রতাপশালী ধনী আদিনাথের বর্ণনা আছে। একটু উপকাহিনির আদলেই উপস্থাপিত এই গল্পটা। আদিনাথের পরিবারের কুল-পুরোহিতের বংশধর মিঠুসারের স্কুলের শিক্ষক মুকুল এই পোড়োবাড়িতে থাকে। বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদ আর তার সহযোগী নাটেশ্বরের ইদু ছৈয়াল মাঝে মাঝে এখানে আসে রাতের অন্ধকারে ফুর্তি করতে। এখানে রেহানার উপস্থিতি নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বকুল ফুলের শুকনো মালা'। আগের দুই অধ্যায়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। আদিনাথের ভিটেতে স্বপ্নের খেলাঘর পাতে রেহানা আর ইয়াকুব। আছে মুকুলের প্রসঙ্গ। মুকুলকে ব্যবহার করা হয় খেলাঘরে মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। আদিনাথের ভিটেতে 'কোথাও কোনো কোলাহল নেই; সবকিছু মন্থর, শিথিল, নিরুদ্বেগ।'[৩] অথচ বাইরে সারা দেশে আগুন জ্বলে। আদিনাথের ভিটের স্নিগ্ধ কোমলতার বিপরীতে পাকবাহিনীর তাণ্ডবে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছবি ইঙ্গিতে আখ্যানে জায়গা করে নেয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব চোখে পড়ে। যুদ্ধ আর ব্যক্তিক অনুভূতি ভিন্নমাত্রায় আপাতদৃষ্টিতে উপস্থাপিত হলেও পাঠকের মনে উৎকণ্ঠার

জন্ম নেয় কীভাবে এই দুটোকে লেখক সম্পৃক্ত করবেন? রেহানা শৈশবস্মৃতিতে ডুবে যায়। সে তার দাদাভাই, দিদামণির গল্পে ভরিয়ে তোলে আদিনাথের পোড়োভিটেকে। তার দাদাভাই বকুলবালা নামের এক নারীকে ভালোবাসত তাই বকুলফুলও তার প্রিয় ছিল। এখন বকুলতলায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছে—এরকম গল্পে মুখর হয়ে ওঠে রেহানার খেলাঘর। হয়ত এজন্যই এ অধ্যায়ের নাম এরকম হয়েছে। কথার মালা গাঁথতে গাঁথতে রেহানা ঘুমিয়ে পড়ে। ইয়াকুব রেহানার ঘুমের বর্ণনা দেয় যার মধ্যে এক ধরনের জটিলতার আভাস আছে। সরাসরি রেহানার কোনো সংকটের কথা আমাদের বলেন না লেখক। কিন্তু দীনদুঃখীর মতো দলামোচড়া হয়ে শুয়ে পড়ার বর্ণনায় একটা কিছু বলার চেষ্টা আখ্যানে নাটকীয় উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'টুনুর চিঠি'। চারদিন আগের কথা। ফ্লাশব্যাক রীতিতে পেছনের ঘটনা উপস্থাপন করা হয়। এখানে রেহানার শহর থেকে গ্রামে মানে ইছাপুরায় আসার গল্পটি বলা হয়। ইয়াকুবের বন্ধু মনোয়ার ওরফে টুনু। টুনু একটা ছোট্ট চিঠি লিখে পাঠায় ইয়াকুবকে। রেহানা তার চাচাতো বোন তাকে দেখাশোনা করার জন্য। এখানে রেহানার উপস্থিতি সরাসরি নেই। তবে তার প্রসঙ্গ আছে আর তার সাথে আছে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। যুদ্ধের তৎপরতা সেভাবে কোনো প্রভাব ফেলে না ইয়াকুবের ওপর। সে নির্লিপ্তভাবে সবকিছু দেখে, বিবৃতি দেয়। ভোলানাথ কবিরাজের বাড়িতে রেহানাকে রাখার ব্যবস্থা হলেও সে সেখানে থাকতে পারে না শেষপর্যন্ত। ইয়াকুব তাকে নিয়ে যায় আদিনাথের ভিটেতে মুকুলের ঘরটাতে। এই অংশের শেষে রেহানার কথার মধ্যে একটা বীভৎস স্মৃতির ইঙ্গিত আছে। ভোলানাথ কবিরাজের বাড়িতে বিড়াল টুনটুনি পাখি ধরে জ্যান্ত ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছিলো এই ভয়ংকর দৃশ্য রেহানার প্রেক্ষণ বিন্দুতে উপস্থাপন করা হয়। যেটা আসলে প্রতীকায়িতভাবে যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশের রূপ।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'হিজলবনের নখের কাছে'। এখানে একটা লাশের প্রসঙ্গ দিয়ে অধ্যায় শুরু হয়। মুকুল অনেকটা দূতের মতো সেই লাশের সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সংবাদ তুলে ধরে ইয়াকুবের কাছে। কিন্তু এর সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কথা বলতেও ভুলে যায় না। মুকুলের লড়াকু মেজাজ আর এদেশের মুক্তিপাগল ছেলেদের অসম সাহসিকতার গল্প ইয়াকুবকে আশ্বস্ত করতে পারে না যেন। একটা সন্দেহ তার মনে উঁকি দেয় :

> কিসের জোরে মুকুল এমন আন্দাজ করতে শিখেছে। ...তার এই হঠাৎ লড়াকু মনমেজাজ আমার কাছে ফাঁকা ঢ্যাবঢেবে মনে হয়। কেমন যেন খাপছাড়া; দৃঢ়তার চেয়ে মিথ্যে ঢাকঢোল পেটানোর বহরটাই বেশি, ... গ্রামে না আছে কোনো সাজ-সরঞ্জাম, না কোনো সংগঠন, পরিকল্পনা; এখনো নিয়মিত কনুই সাদা করে ক্যারম খেলা হয়, বাজারের চায়ের দোকানে চুটিয়ে গুলতানি চলে, এরা স্বপ্নের জগতে যে-যার সুস্থির নিরাপত্তার সুখটুকুকে ফুটফাটের গুজবে মাঝে মাঝে একটু চাঙ্গা করে নেয় মাত্র। হাতেগোনা কয়েকটা ছেলে, অধিকাংশই যারা বয়সে তরুণ, দেশান্তরী হয়েছে। ভরসা বলতে এইটুকুই। দূর থেকে এরাই স্বপ্নের দরোজা খুলে দিয়েছে, আশা-ভরসা যেটুকু পল্লবিত তা ওই গুটিকতক তরুণের কল্যাণেই।[৪]

এই উদ্ধৃতিটিতে লেখক যেন ইয়াকুবকে দিয়ে আরেকটি সত্তা দাঁড় করিয়ে এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আপামর জনসাধারণের অভিব্যক্তিকে তুলে ধরেন। ইয়াকুব আপাত অবিশ্বাসী ভঙ্গি দিয়ে পুরো বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এর মধ্যেওতো দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি মমত্ববোধও রয়েছে। এখানে ইয়াকুবকে অনেকটা *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের খোকার মতো মনে হয়। কিন্তু খোকার চেয়ে ইয়াকুবের আত্মসমালোচনা একটু বেশি স্পষ্ট। সে বলে, 'আমার মতো হাত-পা-গোটানো উদ্যমহীন কাতর মানুষজনের সংখ্যাই তো বেশি।'[৫] লেখক এই অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করান পাঠককে মুকুলের সক্রিয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে আর ইয়াকুবের নিষ্ক্রিয় চেতনার মধ্যে যে সন্দেহ আর যৌক্তিকতার ঝড় ওঠে তার মধ্য দিয়ে। বিষয়কে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে লক্ষযোগ্য। এই অংশে রেহানার কোনো উপস্থিতি নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'ঘাটের কথা'। এখানে ইয়াকুব আর রেহানার খেলাঘরে গার্হস্থ্যজীবন সমস্ত উপকরণ নিয়ে হাজির। এখানে রেহানা হয়ে যায় আন্না। 'কামরাঙা গাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় পাতা তিন ইটের চুলো'[৬]তে তাদের রান্নার আয়োজন হয়। আর তার সাথে আছে রেহানার ছেলেবেলার গল্প। যে গল্পের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে কষ্ট। আন্নার ছেলেবেলার সই পাতার অত্যাচারিত হওয়া শৈশব এবং করুণ মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ অনেকটা প্রতীকী উপস্থাপনা। কেননা এরকম অত্যাচারের বিবরণে আখ্যানে একটা সমস্যা ঘনীভূত হয়ে ওঠার আভাস পরিলক্ষিত হয়। এই অংশে যুদ্ধের কোনো পরোক্ষ প্রসঙ্গও থাকে না।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জলপিপি'। এই অংশে আন্না আর ইয়াকুবের মিষ্টি খুনশুটিভরা খেলাঘরে খুবই নিরীহ একটা বর্ণনায় আখ্যানে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। এখানে ইয়াকুব হয়ে যায় আন্নার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী বাবু। কথা প্রসঙ্গে আন্না বলে, 'ঝগড়া কাকে বলে জানো-ই না। গোলা-বন্দুক-বারুদ ছাড়া আবার ঝগড়া চলে নাকি; আর তো সব ঝগড়া-ঝগড়া খেলা!'[৭] এই সংলাপে ঝগড়ার প্রতীকে যুদ্ধের বীভৎসতাকে তুলে ধরার চেষ্টা আছে। এবং এর সাথে আছে জীবন সম্পর্কে ইয়াকুবের নেতিবাচক অনুভব। এখানে আন্না আর ইয়াকুবের একটু ঘনিষ্ঠ মানবীয় সম্পর্ক তৈরি হয় যা কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম 'তেঁতুলগাছের গোড়ায়'। এই অংশে ইয়াকুব নিজের শৈশব নিয়ে স্মৃতিচারণা করে। তার শৈশবও যন্ত্রণাময় তবে আন্নার মতো নয়। নিরাশ্রয় এক অসহায় মানুষের গঞ্জনায় ভরা শৈশব। এখানে আন্নার সঙ্গে ইয়াকুবের ঘনিষ্ঠতার কারণে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির জন্য ইয়াকুবের অপরাধবোধে ভোগার বিষয়টি উঠে আসে। লেখক আখ্যানে চরিত্রের বিকাশ এবং আচরণের কার্যকারণসূত্রও ছোটো ছোটো ঘটনার আলোকে উপস্থাপন করেন। এই অংশে মুকুল আবার মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। গেরিলাদের সফল আক্রমণের বিবরণ আছে। আসলে আখ্যানে সমান্তরালভাবে ব্যক্তি জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরা হয়। ফলে পাঠকের সংশ্লিষ্টতাও ঘনীভূত হয় আখ্যানের সাথে অর্থাৎ কীভাবে আন্না আর ইয়াকুব দেশের অশান্ত পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হবে এটা ভেবে।

নবম অধ্যায়ের শিরোনাম 'আন্না'। আন্না আর বাবু নিজেদের মধ্যেকার ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে ওঠে। তারপর বাবু মানে ইয়াকুব বলে, 'সেই তুমুল বৃষ্টিতে বিছানার একপাশে বসে গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে কেবল মা-মরা ছেলেমেয়ের মতো কাঁদতে থাকি।'[৮] নর-নারীর সম্পর্কের বিষয়টিতে লেখকের একটা ভিন্নধর্মী দৃষ্টিকোণ পরিলক্ষিত হয়। এই অংশে আদিনাথের ভিটেতে বৃষ্টিতে মুখর আকাশ আর মুখর আন্না-বাবুর হৃদয়। এই অধ্যায়ের শেষ বাক্যটিতে লেখক সরাসরি উপস্থিত হন। বলেন, 'আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, কেবল এইটুকুই।'[৯] এইটুকুই অর্থ আন্না বাবুর খেলাঘরে সৃষ্ট অন্তরঙ্গতাকেই বোঝানো হয়। এই অধ্যায়ে এর আগেও একবার লেখক এভাবে আখ্যানে আসেন। এখানে আর যুদ্ধের প্রসঙ্গ নেই। একদিক থেকে যদি এভাবে ধরা হয় আন্না বাবুর সম্পর্কটা একটা পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে সে অর্থে এই অধ্যায়ে তার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

দশম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ছৈ-তোলা নৌকো'। খালেক মাঝির ছই-তোলা নৌকায় করে আদিনাথের ভিটেতে আসে মুকুল আর রেহানার চাচাতো ভাই টুনু। এখানে আখ্যানে ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয়। রেহানার সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততা আসলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা। রেহানা সম্পর্কে টুনু জানায়—'মাঝে একটা মিসহ্যাপ ঘটে গেছে— ...করাচি পুলিশরা ওকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। ও তো হোস্টেলে থাকতো, লাইব্রেরি থেকে ফিরছিলো সেই সময়।'[১০] শেষে রেহানাকে হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে টুনু। রেহানার শৈশবও রক্তাক্ত। টুনু বলে, '. . . যখন কোলের, তখন আরেকজনের সঙ্গে পালিয়ে গেল ওর মা, লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে না পেরে শেষে গলায় দড়ি দিলো বাপটাও। দাদা-দাদির কাছে মানুষ। বংশের একমাত্র মেয়ে—।'[১১] খেলাঘর ভেঙে যায়। টুনু রেহানাকে নিয়ে খালেক মাঝির নৌকায় যাত্রা শুরু করে দিঘলীর লঞ্চে উঠবে বলে। উদ্দেশ্য গ্রামের বাড়িতে রেহানাকে পৌঁছে দেওয়া। উপন্যাসের নয়টি অধ্যায় জুড়ে যে মৃদু উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছিল সেটার পূর্ণতা ঘটে এখানে। যুদ্ধের ভয়াবহতার নির্মম শিকার এই নারী। সে তার সমস্ত সতেজতা দিয়ে সব ভুলে থাকতে চায়। মাহমুদুল হকের দেখার এই নিজস্ব ভঙ্গিটি চমৎকার। একজন ধর্ষিতা নারীকে সমস্ত কালিমা থেকে মুক্ত করে এক পবিত্র অনুভবে জারিত করে উপস্থাপন করেন। এবং এই অংশে এসে আখ্যানের যে পরিবর্তন ঘটে তাও প্রকরণগত পরিচর্যার ক্ষেত্রে লেখকের মুনশিয়ানাকে তুলে ধরে।

শেষ অর্থাৎ একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'ম্যাজিক মুকুল'। এই অংশটি মুক্তিযোদ্ধাদের ম্যাজিকের মতো তৎপরতার বিবরণ আছে। যে বিবরণের সাথে আবার মুক্তিযোদ্ধাদের একটা সাতজন তরুণের দল এসে আদিনাথের ভিটেতে ওঠে। সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে যায় আখ্যান যুদ্ধ পরিস্থিতির সাথে। আর আন্নার ফেলে যাওয়া খেলাঘরে স্মৃতিকাতর ইয়াকুব সবই দেখে এবং মন্তব্য করে, 'দেখছি সবকিছুই।'[১২] শেষ পর্যন্ত ইয়াকুব যুদ্ধের উন্মাদনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না। তবে আখ্যানে ইয়াকুবের নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে রেহানার জীবনকাহিনিই বেশি গুরুত্ব পায়।

সরলরৈখিক এই আখ্যানের বিবরণদাতা উত্তমপুরুষ। লেখক নিজে নবম অধ্যায়ে দুইবার সরাসরি পাঠকের সামনে উপস্থিত হন। কাহিনি উপস্থাপনায় সক্রিয় বিবরণরীতি এবং

ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি দুটোই ব্যবহার করা হয়। কাহিনি বর্ণনায় নাট্যানুগ পদ্ধতিরই প্রয়োগ আছে। কাহিনির প্রারম্ভ বিকাশ এবং ক্লাইম্যাক্স ও পরিসমাপ্তি রয়েছে। রেহানা আর ইয়াকুব একসাথে আদিনাথের ভিটেতে খেলাঘর পাতে। তারপর তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কের সূত্রপাতের পরপরই রেহানার দুর্ঘটনার সংবাদ এবং খেলাঘর ভেঙে তার চলে যাওয়া আরেক গন্তব্যে। এই আখ্যানে সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি উপস্থাপিত হয় যদিও লেখকের অভীষ্ট লক্ষ্য রেহানার চরিত্রের বিকাশ বা তার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে দেখানো। আখ্যানভাগ একরৈখিক হলেও বারবার রেহানার শৈশবের বিবরণ উপস্থাপন করা হয় এবং এর সাথে তার বর্তমান জীবন একই সমান্তরালে সংযুক্ত হয়। আখ্যানের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রায় চার পৃষ্ঠা জুড়ে রেহানা ক্রমাগত শৈশবের কথা বলে যায় যার সাথে লেখকের *নিরাপদ তন্দ্রা* উপন্যাসের হিরনের মিল রয়েছে। অন্যদিকে রেহানার স্বতঃস্ফূর্ততা, কথার তুবড়ি ছোটানো লেখকের *অনুর পাঠশালা* উপন্যাসের সরুদাসীকে মনে করিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে লেখা হলেও উপন্যাসটি আসলে ব্যক্তিমানুষের জীবনাবেগকেই ছুঁয়ে যায়। এবং মুক্তিযুদ্ধ ব্যক্তির সহজসরল প্রাণবন্ত জীবনকে কীভাবে বিষময় করে সেটা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। আখ্যানভাগ প্রলম্বিত হয়নি। ঠাসবুনোটে বাঁধা একটা গল্প নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়ে ছবির মতো অঙ্কিত হয়।

এই উপন্যাসে পটভূমি, পরিবেশ এবং ঘটনার সঙ্গে সংগতি রেখে চরিত্র রূপায়ণ তথা চরিত্রের বিকাশ ঘটানো হয়। মাহমুদুল হক সবসময় বাইরের ঘটনার সাথে ভেতর দিক থেকেও আয়োজন করেন চরিত্রের অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচনের জন্য। এখানে চরিত্রায়ণে নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি আর দুএকক্ষেত্রে কথকের প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে চরিত্রের মৌল স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা হয়। রেহানার প্রতি লেখকের ফোকাস নিবদ্ধ। তার সরব উপস্থিতি আখ্যানের প্রাণ। নাটকীয় পদ্ধতিতেই প্রায় নির্মিত এই চরিত্রের বিকাশে লেখকের সযত্ন মনোযোগের ছাপ স্পষ্ট। সে একজন কলেজ পড়ুয়া প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর মুখরা মেয়ে। অনেকগুলো নামের মতোই তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আদিনাথের ভিটের নিবিড় ঘন বনের অনাবিল অকৃত্রিম সৌন্দর্যের মতোই সহজসরল প্রাণবন্ত এই মেয়েটি। তার অনর্গল কথা যার বেশিরভাগই শৈশবের স্মৃতিতে ভরপুর। এর মধ্য দিয়ে একটা স্নিগ্ধ মানবী হৃদয়ের প্রকাশ ঘটে। শৈশবের ভালোলাগার সাথেও কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে কিন্তু সেগুলো মারাত্মকভাবে তাকে আহত করে বলে মনে হয় না। কেননা তার চেয়েও মারাত্মক আঘাত তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। আখ্যানের দশম অংশে এসে এই চরিত্রের জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্পটি পাঠক শোনে তারই চাচাতো ভাই টুনুর কাছ থেকে। পাকবাহিনীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে রেহানা। তার চরিত্রের এই বিবর্তন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়।

> মুক্তিযুদ্ধকালে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে ধর্ষিত মানবিক ভারসাম্য বিচলিত এক যুবতী মেয়ের স্বপ্ন নিয়ে জীবনের খেলাঘর রচনা করেছেন তিনি। এই ভুবনে আমরা দেখি মেয়েটির বন্ধুতার জন্য আকুলতা, খেয়ালিপনা, নারীর স্বভাবধর্মের অবিচলিত বহিঃপ্রকাশ। অথচ ধর্ষিতা হওয়ার পর তার বিপর্যয় ও মনোবেদনা এই নারী আন্নাকে সত্যিকার অর্থেই উন্মাদ করে তুলেছিল। গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়ার পর আন্নার আচরণে

> কোনোভাবেই প্রকাশ পায় না পাকিস্তানি বর্বররা তার শরীর ও মনকে খাবলে খেয়ে কী করে দিয়ে গেছে।[১৩]

আর এই মেয়েটিকে নিরাপদ আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে বিক্রমপুরের ইছাপুরায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে ভোলানাথ কবিরাজের বাড়ি থেকে আসে মিঠুসারে আদিনাথের পোড়োভিটেতে। পুরো আখ্যানজুড়ে মেয়েটির সরব স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির পাশে শেষে এসে এই বিপর্যয়ের বর্ণনায় চরিত্রায়ণে বেশ অভিনবত্ব সৃষ্টি করে। কেননা কোথাও পাঠক এই বিষয়ে কিছুই অনুভব করতে পারে না। এবং দশম অধ্যায়ে শুধু রেহানার বর্তমান নয় অতীতের যন্ত্রণাময় জীবনের কথাও জানা যায়। অবহেলায় ছেড়ে মায়ের চলে যাওয়া, বাবার আত্মহত্যা, ছোটবেলার সহপাঠী বাবু এবং সইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু—সবমিলিয়ে প্রায় নিঃস্ব মেয়েটি স্বপ্নের ঘোরে তৈরি করে স্বপ্নের খেলাঘর। জীবনের এত অতৃপ্তিই তাকে বারবার শৈশবের কাছে নিয়ে যায়। আখ্যানে দুএকবার প্রতীকায়িতভাবে এই চরিত্রের চেতনায় যুদ্ধের বীভৎসতার প্রকাশ ঘটে। এর পাশাপাশি তার নারী হৃদয়ের গোপন আকুতিও লেখকের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত হয়। ইয়াকুবের আকস্মিক ঘনিষ্ঠ আচরণ তাৎক্ষণিকভাবে বিষণ্ন করলেও শেষপর্যন্ত গভীর আবেগে তাড়িত হয়ে রেহানা বলে:

> একটু পরে, একটু আস্তে, একটু গা-সওয়া হয়ে নিক আগে তারপর—. . . তোমার যেমন খুশি ভালোবেসো, যা ইচ্ছে তাই নিও, যত খুশি। কেউ কোনো দিন আমাকে ভালোবাসে নি, বুঝতে পারছো বাবু, ওসব আমি চিনি না, আমাকে একটু বুঝতে দাও, দিনরাত আমি কত চেষ্টা করছি, নিজের সঙ্গে লড়াই করছি, বুঝতে পারো না? তোমাকে সব দেবো, তুমি সব নিও, শুধু একটু সময় আমাকে বুঝতে দাও—।[১৪]

এই আত্মনিবেদনের মধ্যেও একটা কষ্ট লুকিয়ে আছে, অসহায়তা লুকিয়ে আছে। এজন্যই এই চরিত্রটির আবেদন অনন্যসাধারণ হয়ে যায়। যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশের নগ্ন বিভীষিকার জীবন্ত বলি রেহানা চরিত্রটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একক স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান। এই উপন্যাসের বিবরণদাতা ইয়াকুব চরিত্রের আয়োজন রেহানার চরিত্রের বিকাশ দেখানোর জন্য অনেকটা। সে লেখকের প্রতিনিধি হয়ে রেহানা শুধু নয় পুরো আখ্যানকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরে। তার দৃষ্টিকোণে কাহিনি উপস্থাপিত হয়। সে একসময় ঢাকায় চাকরি করলেও বর্তমানে গ্রামের একটা বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। তার ওপর দায়িত্ব পড়ে শহরের বন্ধু টুনুর চাচাতো বোন রেহানাকে দেখাশোনা করার। তার সঙ্গে রেহানার একটা সখ্য গড়ে ওঠে। তার ভাষায় :

> হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেলি আমি, পাগলের মতো আমি ওর গালে চুমু খাই, তারপর দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে মাথা নিচু করে পড়ে থাকি। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় ব্যাপারটা, যার ভেতর যোগ-বিয়োগ হিসেব-নিকেশ কিছুই থাকে না; বাতাসের মৃদু স্পর্শে যেভাবে গাছের পাতাগুলো নড়ে, একটা সামান্য পাখি পাতার আড়াল থেকে আরেকটা গাছের ডালে গিয়ে বসে, কতকটা সেইভাবে।[১৫]

এরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চরিত্রের মানসপ্রবণতার বিশেষ দিকটি তুলে ধরেন লেখক। এক ধরনের অপরাধবোধে ভোগে ইয়াকুব। এবং সেও উঁকি দেয় নিজের শৈশবে। যেখানে শুধুই অসহায়তা, নিরাশ্রয় অবস্থা। এই চরিত্রের নির্লিপ্ততা, নিষ্ক্রিয়তা বা নিরাসক্তির

পেছনে এর মনোগঠনের ভূমিকা রয়েছে। ছোটবেলা থেকে ভাগ্যের নির্মম হাতের নির্দয় শিকার বলেই সে বিশ্বাস করে, 'জীবনে প্রত্যাশা থাকতে নেই, প্রত্যাশা থাকলেই মার খেতে হয়।'[১৬] আর এজন্যই সে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আশা করতে ভয় পায়। কেননা ঐ সময় ঠিক যে সবকিছু সংঘবদ্ধভাবে পরিকল্পনামাফিক চলছিল, এমনটাতো বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই চরিত্রের নির্লিপ্ততা লেখকের *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের খোকা চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। খোকারও মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন বা গণমানুষের জাগরণকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা ছিল। মাহমুদুল হক এক সাক্ষাৎকারে খোকা চরিত্রে বোদলেয়ারের প্রভাব স্বীকার করে বলেন :

> সবকালেই সবদেশে ওরকম কিছু মানুষ থাকে যারা প্রবল কোলাহলেও একা, যারা জনতার সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। ...জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা, জনতার কোলাহল বা জেগে ওঠা সবই তো দেখিয়েছি, ...আর দেখিয়েছি বলেই খোকার ওই নিরাসক্তি এমন তীব্রভাবে চোখে পড়ে।[১৭]

লেখকের এই বক্তব্য পুরোপুরি মিলে যায় ইয়াকুবের ক্ষেত্রেও। পূর্বাপর জীবন সম্পর্কে তার নেতিবাচক ধারণা লক্ষ করা যায়। আদিনাথের ভিটের আজকের ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে মানুষের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আগ্রহকে সে ব্যাখ্যা করে এভাবে : '. . .এত মারামারি, এত কাটাকাটি, অথচ ক'দিনেরই বা সব, সবকিছু দ্যাখো কেমন মানুষের অভাবে পড়ে থাকে, হা হা খা খা করতে থাকে; যেনতেন প্রকারেই হোক জীবনটাকে কোনোমতে পার করে দেওয়া—।'[১৮] শুধু জীবন সম্পর্কেই সে এভাবে ভাবে তা নয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বন্ধু মুকুলের উত্তেজনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী ভূমিকা এসবের ব্যাপারেও সে এমনই নির্লিপ্ত। ইয়াকুবের এই ভাবনার সঙ্গে খোকার অনেকটা মিল আছে। একই নিরাসক্তি দুটো চরিত্রের মনোগঠনের মধ্যে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইয়াকুব চরিত্রের এই নির্লিপ্ত মনোভঙ্গি অটুটই থাকে। রেহানার পাকবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কাহিনি তাকে আকুল করে। ঐ সময়ে তার ভাবনাটা এরকম :

> সবকিছু তেতো হয়ে যায়। মনে হলো এই মুহূর্তে টুনু করাচি পুলিশের চেয়েও খারাপ। ঘাটের বাশ দিয়ে ঠেকানো কচুরিপানার নিচে আন্না পাতাকে দেখে ভয় পেয়েছিল। এই মুহূর্তে লতা আর পাতা দু'জনকেই আমি দেখতে পাই, কচুরির তলায় চুল ভাসিয়ে দু'জনেই রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।[১৯]

এবং রেহানার চলে যাওয়ায় সে কাতর হয়। তখনকার মনোভাব ফুটে ওঠে এভাবে, 'সারা বরান্দায় আন্নার পায়ের ছাপ। ... বিলের ওপর পাগলা বাতাস দুমড়ে একাকার হয়ে যায়। ছলছলে পানির কোল ঘেঁষে ওই তো ঘুমশাক, ...ভাই ঘুমশাক, আন্নাকে তুমি মনে রেখো।'[২০] ইয়াকুবের অনুভূতির সক্রিয়তা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা নেই। রেহানার চলে যাওয়ায় সে সত্যিই ব্যথিত হয় কিন্তু ওই পর্যন্তই। এমনকি তাদের খেলাঘরে সশস্ত্র সাতজন মুক্তিযোদ্ধা এসে হাজির হলেও চেতনাগত কোনো পরিবর্তন ইয়াকুবের ঘটে না। এই যে সকল লোকের ভেতর থেকেও একা থাকা বা নিজেকে সবকিছুর সাথে মেলাতে না পারাটা, এটাই তার ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার মানে এই নয় যে সে অক্রিয়। সবকিছুকে সে দেখে, উপলব্ধি করে। নিজের মধ্যে নিজে যুক্তিতর্ক দাঁড় করায় এবং একটা সিদ্ধান্তে আসতে চায়। কিন্তু সবই

ভেতরে ভেতরে। বাইরে কোনো উদ্যোগ নিতে পারে না। এই চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য। একটু অক্রিয় তবে অনুভূতির রাজ্যে ভীষণ সক্রিয়। মাহমুদুল হক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একজন এরকম নিষ্ক্রিয় মানুষকে দিয়ে পুরো বিষয়টাকে পক্ষপাতহীনভাবে তুলে ধরতে চান। প্রায় নাটকীয় পদ্ধতিতেই চরিত্রটি রূপায়িত হয় এবং তার মনের ভেতর আলো ফেলে তার মুখ দিয়েই তার ভাবনাকে তুলে ধরা হয়। এখানে মুকুল চরিত্রের আয়োজন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করার জন্য। সে মিঠুসারের এক স্কুলের শিক্ষক এবং আদিনাথের পরিবারের কুল-পুরোহিত যজ্ঞেশ্বরের নাতজামাই নন্দর ছোটো ভাই। বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদের অনুমতিক্রমে সে আদিনাথের পোড়োভিটেতে থাকে। যাত্রাপাগল এই মুকুলচন্দ্র ঝড়ের মতো রেহানা আর ইয়াকুবের খেলাঘরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য আর পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেয়। এই চরিত্রটিকেও আমরা দেখি ইয়াকুবের প্রেক্ষণ বিন্দুতেই। নাটকীয় পদ্ধতিতেই একে অঙ্কিত করা হয়। মুকুল পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ দেয় এভাবে :

> অহনে হালাগো মাথা খারাপ হয়া গেছে, যা মনে লয় করতাছে। আমাগো মজিদ ব্যাপারী কইলো কবে জানি বলে আয়া আটি থিকা হাটের ব্যাক গরুগুলিনরে টাইনা হিচরায়া লয়া গেছে খাওনের লাইগা। . . . যাওনের আগে কয় বলে নিশানবাড়ির বাইচের নাওখানরেও জ্বালায়া দিয়া গেছে। . . . রজব আলী মিয়া আছিল নাচনের ওস্তাদ; কতবার বাইচের সময় হ্যারে দেখছি নিশানবাড়ির নাওয়ের গলুইয়ে নাচবার। গাওনের ঢঙ দেইখ্যা মাথা ঘুইরা যায়। দেহখানও আছিল। হ্যারেও বলে বেউনেট খোচায়া মাইরা গ্যাছে—।[২১]

উপভাষার সংলাপে জীবন্ত এই চরিত্রটি জীবনকে দেখে প্রকৃতির মতোই সারল্যে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উচ্ছ্বাস আছে। উচ্ছ্বাস, আবেগ আমাদের ছিল বলেই এই যুদ্ধে জেতাটা সম্ভব হয়। তাই শুধু আবেগ আর বিশ্বাস এবং তার সাথে ইচ্ছাশক্তি সম্বল করে আপামর জনসাধারণ একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। মুকুল সেই আপামর জনসাধারণের প্রতীক। মুকুলের আত্মবিশ্বাসী রূপের কাছে ইয়াকুবের অবিশ্বাসী নিষ্ক্রিয় মনোভাব বেশ বৈপরীত্য সৃষ্টি করে আখ্যানভাগকে বেগবান করে। মুকুল মোতরার ঘন বনের কোলে ফুলে ওঠা দৈত্যাকৃতির লাশটি সম্পর্কে বলে :

> ... কাউয়ায় আর কিছু খাই নাই, হুদাহুদি চ্যাটটারে খায়া থুইছে। পেনাবিবির মাইয়ার জামাই হইলেও হইতে পারে, শুনতাছি যেমুন খুন হইছে দুই রাইত আগে। ক্যামনে যে ভাইসা আইলো! অহনে আমাগো পিয়ার মোহাম্মদ আর ইদু ছৈয়ালরে দেহাইতারলে কাম হইতো। গাঁও-গেরামের কম মাইয়ারে ফুশলাইয়া বেইচা দিছে হ্যারায়![২২]

এভাবে চরিত্রের পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বরূপকে তুলে ধরে তার মানসপ্রবণতার পরিচয় দেন লেখক। ইয়াকুব মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মুকুলের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বলে, 'ওর ভেতরে যে সাহসের চারাগাছ ধীর পায়ে একটি একটি করে পাতা মেলতে শুরু করেছে তা তো চোখের সামনেই দেখছি।'[২৩] যদিও এই প্রস্তুতি লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে দেখে আমাদের প্রয়োগটা শুধু দেখান। আসলে উপন্যাসের অবয়ব শীর্ণকায় হওয়ায় চরিত্রকে বিপুল আয়াসে লেখক উপস্থাপন করেন না। তারপরেও যুদ্ধের সমস্ত উন্মাদনায় এক মানবিক জীবনবোধে তাড়িত চরিত্র মুকুল। যে নিরুপদ্রব খেলাঘরে যুদ্ধ আর আশার কথা একসাথে উপস্থাপন করে। একরৈখিক এবং সরল এই চরিত্রটিও এক অর্থে আখ্যানের এক অংশের কথক। টুনুকে সরাসরি দশম অধ্যায়ে দেখা যায়। যদিও চতুর্থ অধ্যায়টা 'টুনুর চিঠি' নামে এবং এই

অধ্যায়ের পুরোটা জুড়ে টুনুর মানসপ্রবণতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ইয়াকুব। ঢাকায় এক বিজ্ঞাপন সংস্থার কমার্শিয়াল আর্টিস্ট মনোয়ার ওরফে টুনু। কথকের বন্ধু আর রেহানার চাচাতো ভাই। ইয়াকুব টুনু সম্পর্কে বলে, 'আমাদের অফিসে ও বিখ্যাত ছিল খিস্তির জন্যে। খিস্তির তুফান ছোটাতে ওস্তাদ ছিল টুনু।'[২৪] আজ তাকে দেখে ইয়াকুব বলে, 'টুনুর পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো, এ যেন সেই হাসিখুশি সপ্রতিভ টুনুই নয়; জ্বরে ভোগা চেহারা, চাল-চলনেও ছাপ পড়ে গেছে ভারিক্কি মেজাজের।'[২৫] এই শারীরিক বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধাক্রান্ত দেশের পোড়-খাওয়া তরুণ সমাজের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়। টুনুকে ব্যবহার করা হয় আখ্যানে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করার জন্য। সে অনুঘটকের কাজ করে। রেহানার জীবনের চরম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি উপস্থাপন করে সে। এই চরিত্রের দৃঢ়তার সাথে মুকুলের একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। নাটকীয় ও বিশ্লেষণাত্মক দুই পদ্ধতিরই প্রয়োগ ঘটে এই চরিত্রের রূপায়ণে। পাকবাহিনীর অত্যাচার সহ্য করা দেশের সাধারণ মানুষের নমনীয় মনোভাবকে টুনু ধিক্কার দেয় :

> 'শালার দেশে দু'দশটার বেশি মানুষ নেই—' টুনু ক্ষেপে গিয়ে শানের ওপর একটা কিল মেরে বললে, 'শালারা শুয়োরের বাচ্চা শালারা কুত্তার বাচ্চা, এদের জন্মের ঠিক নেই, শালারা বসে বসে মার খাচ্ছে, এদের কাছে ইজ্জতেরও কোনো দাম নেই, এদের মুখে আমি মুতে দিই—।'[২৬]

মুকুলের মতোই আটপৌরে ভাষার সংলাপে সক্রিয় প্রাণবন্ত চেতনাধারী টুনু। ইয়াকুবের নিষ্ক্রিয়তার পাশে তার স্বতঃস্ফূর্ততা বেশ চোখে পড়ে। টুনুর চরিত্রায়ণেও সংলাপ তথা নাট্যিক বিন্যাসকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। উপন্যাসের শেষ অংশে এসে মুক্তিযোদ্ধা আউটশাহির ছেলে আবুল কমান্ডারকে দেখা যায়। সে তালতলার ক্যাম্পে সফল অভিযান চালায়। একটা রেখায় বাস্তবোচিতভাবে এই চরিত্রকে আঁকেন লেখক। আদিনাথের ভিটের সবকিছু দেখে তার মন্তব্য, 'লাগে জানি আল্লায় ব্যাক আমাগো লাইগ্যা বানায়া থুইছে, অক্করে যুতসই ব্যাকডি, এস-এল-আর খান ওপরে উঠা—।'[২৭] একজন গেরিলা যোদ্ধার ছবি দেখি যেন আমরা এখানে। কয়েক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং পাকবাহিনীর অপতৎপরতার বিবরণ আছে। আরও কিছু অপ্রধান চরিত্রেরও সমাবেশ ঘটে। শান্তি কমিটির মুরব্বি বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদ আর তার সহযোগী নাটেশ্বরের ইদু ছৈয়াল। এরা আইয়ুব খানের পার্টিতে নিমন্ত্রিত হতো। সমাজের শোষকশ্রেণির ভেতরের কালিমালিপ্ত রূপটি ইয়াকুবের প্রেক্ষণবিন্দুতে তুলে ধরা হয়। নারী, মদ, অপকর্ম সব রকমের কাজে পারদর্শী—বিস্তারিতভাবে না হলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে এদের টিপিক্যাল রূপটি এখানে চিত্রায়িত হয়। বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদের ছেলে তরিবত। সে মৃগীরোগগ্রস্ত ছিল। এই তরিবতকে পড়াত মুকুল মাস্টার। সহজসরল এই ছেলেটি দুর্বৃত্ত বাবার বিপরীতে যেন একটা প্রতিবাদের প্রতীক। আছে সংঘবদ্ধ নারী পাচারকারী। যাদের দলে বি.ডি পিয়ার মোহাম্মদ, পেনাবিবি, জয়নাল শেখ, ইদু ছৈয়াল এরা আছে। এদের মতোই ব্যক্তি এবং কাজের প্রসঙ্গ ঠিক লেখকের এর আগের লেখা *মাটির জাহাজ* উপন্যাসটিতেও দেখা যায়। পার্থক্য ঐ উপন্যাসের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ। কিন্তু একই কৌশলে বিয়ের নামে গ্রামের সহজসরল মেয়েদের শহরে নিয়ে ব্যবসায় লাগানোর প্রক্রিয়া মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশেও ছিল। তাহলে মুক্তিযুদ্ধ জনমানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আনতে পারেনি

এমন একটা বিশ্বাস ভ্রান্ত নয়। এই উপন্যাসে একদা সম্ভ্রমশালী আদিনাথের প্রসঙ্গ আসে। সামন্ত প্রভু রক্ষিতার কাছে সব বিলিয়ে দেয়—সেটাও একধরনের শ্রেণিচরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। আদিনাথের ভিটের কয়েক পুরুষের উত্তরাধিকারী মুকুলের ভাই নন্দর প্রসঙ্গও আছে। সে এই ভিটের ইট কাঠ বিক্রি করে দেয়। কথায় বলে সম্পত্তি এক পুরুষ অর্জন করে আরেক পুরুষ ভোগ করে আর তৃতীয় পুরুষ উড়িয়ে দেয়। অনেকটা তেমনি ইঙ্গিত আছে এই নন্দর মধ্যে যদিও নন্দ সে অর্থে তৃতীয় পুরুষ নয়। আদিনাথের ভিটেতে মুকুলের পাশাপাশি একজন বৃদ্ধা মাঝে মাঝে এসে থাকে। এই বৃদ্ধাকে নিয়ে তেমন কোনো কথা নেই। তবে এই বৃদ্ধা যেন আদিনাথের ভিটের প্রাচীনত্বকে ধারণ করে বর্তমানের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে—এমনটা বলা যায়। এখানে ভোলানাথ কবিরাজের একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের প্রসঙ্গ আছে যে পরিবারের পাঁচটি মেয়ে ইয়াকুবের কলেজে পড়ে। সেখানেই প্রথমে রেহানার থাকার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সে থাকতে পারেনি। এটি মুকুলের মাসির বাড়ি। কবিরাজ গৃহিণী রেহানাকে রাখতে চায়নি। বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে দেখার আছে। কেননা ঐ সময় আমাদের দেশের আপামর মানুষের বেশিরভাগেরই সহযোগিতামূলক মনোভাব ছিল। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও তো থাকতে পারে। সেটাই মাহমুদুল হক দেখানোর চেষ্টা করেন। বাইরে থেকে যা দেখা যায় সেটা যে শেষ সত্য নয় সেটাই আমাদের দেখান তিনি। আখ্যানের এসব চরিত্রের পাশাপাশি অনেকটা জায়গাজুড়ে আছে রেহানার শৈশবের মানুষগুলো। তার সই পাতার চাচির অত্যাচারে বিভীষিকাময় জীবন ছিলো। পানিতে ডুবে মারা যায় সে। রেহানার মতোই সরলপ্রাণ এক কিশোরীর মর্মন্তুদ গল্প আখ্যানে বেশ চমক সৃষ্টি করে। রেহানার আরেক সহপাঠী বাবুর প্রসঙ্গও আছে। আর রেহানার শৈশব জুড়ে আছে তার দাদাভাই, দিদামণি। দাদাভাইয়ের কাছে রেহানা বড় হয়। এই চরিত্রটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত। এই চরিত্রের মানসপ্রবণতার রূপটি তুলে ধরেন লেখক এভাবে, 'বিষয়-সম্পত্তি হলো তোর বিষ, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা মানে সারা জীবন হিংসার সঙ্গে লড়াই চালানো।'[২৮] দাদাভাইয়ের এই ভাবনার সঙ্গে লেখকের জীবনদর্শনের একটা সংগতি পাওয়া যায়। খুব সাধারণভাবে এই চরিত্রের ভাবনার মধ্যে লেখক অসাধারণত্ব আরোপ করেন। দাদাভাই বলতো, 'পাপ জিনিসটাই এমন, ভেতর থেকে মারে, কুরে কুরে খায় উইপোকার মতো, কেউ দেখতে পায় না।'[২৯] এরকম টুকরো টুকরো ভাবনা মিলিয়ে একজন দার্শনিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির স্বরূপ উন্মোচিত হয়। এভাবে অপ্রধান চরিত্রেরও বিশেষত্বকে স্বল্প আয়াসে তুলে ধরেন লেখক। দিদামণি খুব টিপিক্যাল নারী চরিত্র। কিন্তু দাদাভাইয়ের একজন প্রিয় নারী ছিলো বকুলবালা। এই নারী সম্পর্কে দাদাভাই বলে :

> ...কোনো অভিযোগে নেই, কারো কাছে চাইতে শেখে নি, এমন মানুষের বেঁচে থাকা কত কষ্ট ; তবুও সারাক্ষণ মুখে সেই হাসিটা লেগে আছে, আহা, আহা, শুধু কষ্টই পেয়ে গেল, কোনো দিন বোধহয় একবেলাও পেটপুরে দুটো খেতে পায় নি, তবু দ্যাখো মুখে কেমন সেই হাসিটি লেগে আছে, ...।[৩০]

এছাড়া এই নারীর হাতের রান্নার অসাধারণ গুণও শতমুখে ব্যক্ত করে দাদাভাই। এরকম একটা নারী চরিত্র লেখকের *কালো বরফ* উপন্যাসে দেখা যায়। নগেন স্যাকরার মাধুরী যার সাথে দাদাভাইয়ের বকুলবালার অনেকটাই মিল রয়েছে। এরকম 'অপর' নারী চরিত্র

রূপায়ণেও লেখকের মমত্ববোধ আমাদের বিস্মিত করে। রেহানার মতোই ইয়াকুবের শৈশবও দেখা যায়। যেখানে ইয়াকুব খালা আর খালুর প্রতিহিংসার শিকার হয়। অন্যদিকে টুনুর অফিসের কমার্শিয়াল ম্যানেজার বরকত আলির ইংরেজ-প্রীতিকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক তির্যক ভঙ্গি ব্যবহার করেন। মানুষের সাথে হনুমান, তক্ষক, সজারু, বেজিও যেন চরিত্র হয়ে ওঠে আখ্যানে। প্রধান চরিত্রের মতোই অপ্রধান চরিত্র রূপায়ণেও লেখকের সযত্ন মনোযোগের ছাপ স্পষ্ট। এই উপন্যাসে খালেক মাঝির কথা আছে। মাঝির প্রসঙ্গ *নিরাপদ তন্দ্রা* এবং *কালো বরফ* উপন্যাসেও আছে। বিক্রমপুরের নৌ-ভ্রমণের প্রসঙ্গ *কালো বরফ* এবং *মাটির জাহাজ* উপন্যাসে আছে। এখানে সেটা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

খেলাঘর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা সামাজিক উপন্যাস। এখানে ইতিহাস এবং রাজনীতি অনুষঙ্গ হিসেবে আসে। পটভূমি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের গ্রামীণ জীবন ও নাগরিক জীবনের ব্যবহার করা হয়। মাহমুদুল হক এক সাক্ষাৎকারে গ্রামীণ জীবনের ভেতরের অন্তর্কোন্দলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'ওপর থেকে দেখলে গ্রামের জীবনযাত্রাকে সাধারণত নেহাতই সাদামাটা মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণ তার উল্টোটা। কলুষতা, নীচতা, হীনম্মন্যতা শহরের চেয়ে গ্রামের জীবনযাত্রায় অনেক বেশি।'[৩১] এই উপন্যাসে সেই গ্রামীণ পটভূমির প্রসঙ্গে মুকুলের বিষয়টি লেখকের প্রেক্ষণবিন্দুতে আসে এভাবে :

> সে কারো সুনজরের কাঙাল নয়, তবু কিছু লোককে তার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সমীহ করে চলতে হয়। বেঁচে থাকাটাই একটা জটিল ব্যাপার, এত ঘোরপ্যাচ গ্রামের জীবনযাত্রায়। একদল লোক পা-ধোয়া পানি খেয়ে বাঁচে, দু'চারজন পা-ধোয়া পানি বিতরণ করে সমাজের মুকুট হয়ে থাকে। একট-আধটু হুজুর হুজুর তো করতেই হয়![৩২]

এভাবে পটভূমি এবং ব্যক্তিক মনোভাবকে এক সারিতে মেলে ধরেন লেখক। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস বলে এখানে সেই বর্ণনা ধরা পড়ে এভাবে :

> গুলির শব্দের ভয়ে ঢাকা শহরে এখন আর একটি পাখিও ডাকে না। . . . সে তুলনায় কত নিরাপদে আছি, কত নিশ্চিন্তে আছি, ভাবতে অবাক লাগে; অথচ কত কাছে—নৌকো আর লঞ্চ মিলে মোট সাড়ে-তিন চার ঘণ্টার দূরত্ব। এখানে এখনো পাখি ডাকে, বাতাসে এখনো বুনো লতাগুল্মের ঝাঁঝ; পোড়া মানুষ আর বারুদের গন্ধ, রাতের অন্ধকারে আচমকা এক একটা বাড়িতে ভারি-ভারি বুটজুতোর শব্দ, অমানুষিক আর্তনাদ, এই সব নৈমিত্তিক খবরাখবর মাঝেমধ্যে অল্প-বিস্তর হা-হুতোশের আবহাওয়া তৈরি করলেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কখনোই মনে হয় না, যাতে পায়ের তলার মাটি সরে যায়।[৩৩]

গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবন ও শহরের বিধ্বস্ত পরিস্থিতি এভাবে উঠে আসে কথকের বিবরণে। পাকবাহিনীর বীভৎসতার প্রত্যক্ষ বর্ণনাও এখানে আছে। যেমন :

> কয়েকটা স্পিডবোটে করে পাড়ায় এসে নামলো কিছু সৈন্য, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দক্ষিণ চারিগাঁও-এর ওপর। ক'জন হবে? তবে শোনা গিয়েছিল দলে তারা এমন কিছু আহামরি ভারি ছিল না। নমশূদ্রদের এক একটা পাড়া ধরে আর ভুটভাট আগুন ধরিয়ে দেয়। কলুদের একটা ঘানিগাছও আস্ত ছিল না। সব পুড়ে ছাই। এক একটা দুধের শিশুকে কোল থেকে কেড়ে নেয়, তারপর শুরু হয় লোফালুফি খেলা; শেষে বেয়োনেট গেঁথে মাঝে মাঝে আগুনে ঝলসে কাবাবসেঁকা করে।[৩৪]

এরকম বর্ণনায় পটভূমিগত বাস্তবতা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পরিবেশ বর্ণনায় ব্যক্তির মনোভাবের প্রভাব পড়েছে। রেহানার সাথে ভুল বোঝাবুঝির পর ইয়াকুব যখন তীব্র অপরাধবোধে ভোগে তখনকার তার মানসিক অবস্থার প্রভাব পরিবেশের ওপর পড়ে এভাবে :

> অন্য সব দিন ঝপ করে সন্ধ্যা নেমে যায়, আজ আর তা ঘটে না, বিকেলটাকে বিশ্রী রকমের লম্বা মনে হয়। গা চিড়বিড় চিড়বিড় করে। বাতাস আছে ঠিকই, কিন্তু গরমে তা ভাপানো। কাল বিকেলেও বাতাস ছিল, কিন্তু তা ছিল ঠাণ্ডা, শরীর জুড়ানো; তাতে জলজ গুল্মলতার তীব্র ঝাঁঝ আর চিটেগুড়ের মিষ্টি গন্ধ ছিল।[৩৫]

ইয়াকুবের মনের নেতিবাচক অনুভবের প্রকাশ পরিবেশের ওপর পড়ে।

এছাড়া এই উপন্যাসে কাহিনি বয়ানে অতীত আর বর্তমান দুই কালকেই এক সুতোয় বেঁধে উপস্থাপন করা হয়। এ ব্যাপারে লেখক এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> আমার বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে সম্ভবত আমার মায়ের কথাভঙ্গির মিল আছে। আমার মা খুব সুন্দর করে কথা বলতেন, চমৎকার করে গল্প করতে পারতেন। ... তাঁর গল্প বলার একটা নিজস্ব স্টাইল ছিলো। গল্পের তো একটা নিজস্ব কালক্রম থাকে। ... আমার মা সেই কালক্রমকে ভেঙে ফেলতেন। অর্থাৎ যেসব ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটার কথা সেগুলো অবলীলায় অতীত কালের ফর্মে বলতেন, অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে স্থাপন করতেন ভবিষ্যতে।[৩৬]

এই বিষয়টি খেলাঘর উপন্যাসের আখ্যান বয়ানে লক্ষ করা যায়। সময়ের তিনটি স্তর নিম্নোক্ত বর্ণনায় ধরা পড়ে। পাতাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রেহানা বলে :

> ...একটা চন্দন কাঠের ছোট্ট কৌটো নিয়ে এলো একদিন তার ভেতরে মরা কাঁচপোকা, যা সুন্দর দেখতে, তোমাকে কি বলবো! কোথেকে এনেছিল জানিনা। চুপি চুপি আমার হাতের ভেতর গুঁজে দিয়ে পাতা বলেছিল, কাউকে কিন্তু কিছু বলবি না, লুকিয়ে রাখবি, বিয়ের পর আমরা যখন বরের কাছে যাবো তখন টিপ পরবো দু'জনে, ওটার পাখা দিয়ে খুব সুন্দর টিপ হবে দেখিস—।[৩৭]

উপন্যাসের নামকরণটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতীকী অর্থে মানুষ পৃথিবীতে এসে দুদিনেরই খেলাঘর তৈরি করে। তারপর কালের অমোঘ নিয়মে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। পাকবাহিনীর জান্তব আগ্রাসনের শিকার কলেজ পড়ুয়া রেহানা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই মিঠুসার গ্রামে আসে। আর সেখানেই আদিনাথের পোড়োভিটেতে ইয়াকুবের সাথে স্বপ্নের খেলাঘর গড়ে সে। কিন্তু টুনু এসে তার দুর্ঘটনার কাহিনি বলে এখান থেকে তাকে নিয়ে চলে যায় গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। নৌকায় উঠে একবারও নিজের ফেলে আসা খেলাঘর দেখার চেষ্টা করে না রেহানা। এক বুক অভিমান আর যন্ত্রণা নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশের বিধ্বস্ততার প্রতীক রেহানা। তাই উপন্যাসের প্রতীকায়িত এই নামকরণটি যেমন ব্যঞ্জনাময় তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। আখ্যানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কথা বলার সময় স্বরে আক্রমণাত্মকভাবের প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু রেহানা ও ইয়াকুবের কথোপকথনে স্নিগ্ধ কোমলভাবের প্রকাশ লক্ষণীয়। দুএকটা ক্ষেত্র ছাড়া আখ্যানে সে অর্থে কোনো প্রতীকের ব্যবহার নেই।

খেলাঘর উপন্যাসের ভাষারীতির অভিনবত্ব শুধু যে কালক্রমকে ভেঙে তা নয়। এখানে একই সমান্তরালে রেহানা ইয়াকুবের নিশ্চিন্ত, স্নিগ্ধ আর কোমলতায় ভরা জীবনের সাথে মুক্তিযুদ্ধের আক্রমণ আর প্রতিরোধের কথা উপস্থাপিত হয়। তাই ভাষায় ঐরবৎধঃরপ ও উবসড়ঃরপ দুটো ভাবই লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের প্রসঙ্গে আক্রমণাত্মক শব্দ ব্যবহার হয়। রেহানাদের মিষ্টি খেলাঘরে আবেগ আর খুনশুটির ভাষা হয়েছে কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাময়। উপভাষার প্রয়োগও লক্ষণীয়। সংলাপের ক্ষেত্রেও যে সাবলীল গদ্য ব্যবহৃত হয় সে ব্যাপারে লেখকের মন্তব্য, '. . . খেলাঘর উপন্যাসটার ভাষা আমার মায়ের মুখের ভাষা থেকে নেয়া। সংলাপগুলো খেয়াল করে দেখো, ওই ভাষায় আমি বা আমার চারপাশের কেউ-ই কথা বলে না। মা ওই ভাষায় কথা বলতেন।'[৩৮] সংলাপে মানভাষার সাথে উপভাষার প্রয়োগ ঘটে। ঘটনা, পরিবেশ ও পটভূমির সাথে মিল রেখে চরিত্রের মানসপ্রবণতা অনুসারে সংলাপের ভাষা তৈরি করা হয়। কয়েকটি নমুনা :

খেলাঘরে গার্হস্থ্য উপকরণ নিয়ে রেহানার গৃহিণীসুলভ মন্তব্য :

> চা থাকলে তো! তোমার মুকুলচন্দোরটা একটা গবেট, একটা লগবগে লগি, দাঁড়াবার সময় কেমন তেফেরেঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চা-ফা এ বাড়িতে কিচ্ছু নেই—।[৩৯]

রেহানার ওপর অভিমান করে ইয়াকুব বলে :

> রেহানা, আমার নাম ইয়াকুব, তুমি ঐ নামেই ডেকো! তোমার নামটাও তুমি ফেরত নাও—।[৪০]

এর উত্তরে অভিমান আর অনুরাগে বিমুগ্ধ রেহানা বলে :

> নেবো না, একশোবার নেবো না, ভালো না লাগলে ফেলে দাও, লজ্জা করে না তোমার একথা তুলতে? তুমি অমানুষ, তুমি রাক্ষস, তুমি জ্যান্ত মানুষ খুন করতে পারো।[৪১]

আদিনাথের ভিটেতে রেহানাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে এসে ইয়াকুবকে মুকুল বলে :

> হাঁড়ি-পাতিল চাইল-উইল যা পাইছি লয়া আইছি, ঠ্যাকার কাম চালায়া ল। আইজ আমি আর আইতাছি না। রুমের চাবি দিয়া দে, কি কি পাঠাইতে হইবো কয়া ফালা ঝটপট, বিকালে খালেক মাঝিরে দিয়া পাঠায়া দিমুনে—।[৪২]

পাকবাহিনীর নৃশংসতাকে স্মরণ করে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে টুনু এভাবে :

> শুয়োরের বাচ্চারা কচিটি থাকার কোনো রাস্তা রেখেছে নাকি—।[৪৩]

উদ্ধৃত উদাহরণগুলোতে চরিত্রানুগ সংলাপের প্রয়োগে লেখকের সুপরিকল্পিত শৈলীভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়।

এছাড়া এই উপন্যাসের এগারোটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর নিরিখে নামকরণ বেশ শৈল্পিক হয়েছে। আখ্যানে গতি সৃষ্টিতে লেখকের বর্ণনার ভাষা কখনও কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ভরা কখনো নির্মেদ, কখনো আক্রমণাত্মক।

পাকবাহিনীর নারকীয়তার বর্ণনা :

> ইছামতি পার হয়ে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্মিরা। তাঁত আর তাঁতি—তাদের লক্ষ্য দুটোই। নদীর দিক থেকে বেড় দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে ছুড়তে তারা এগিয়ে এলো; আগুন ধোয়া আর চিৎকারের মাঝখানে যে যে-দিকে পারে ছুটে পালায়, যারা পারে না তাদের ধরে ধরে জ্বলন্ত তাঁতের ওপর ছুড়ে দিতে থাকে।[৪৪]

রেহানাকে নিয়ে ইয়াকুবের আবেগতাড়িত হয়ে যাওয়ায় তার ভাবনায় পরাবাস্তব চেতনার প্রকাশ ঘটে এভাবে :

> সেই একইভাবে মাথার পাশে বসে ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে গরিবের মতো তাকিয়ে থাকি। উঠতে ইচ্ছে করে না, চোখ সরাতে পারি না; আচ্ছা কী হয়—আলতো করে ওর ঠোঁটে যদি চুমু খাই? মনের ভেতর তখন এইসব। বালিশের ওপর দিয়ে সে তার চুল ঝুলিয়ে রেখেছিল। যাতে কোনো টান না পড়ে, কোনো রকমে যেন জেগে না ওঠে, ঠিক সেই ভাবে আমি গোছা গোছা চুল মুঠোয় নিই, তখন মনে হচ্ছিল মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি, আমি এ পৃথিবীর কেউ নই, আমি অন্য জগতের মানুষ, আমাকে কেউ চেনে না।[৪৫]

আরেকটি বর্ণনায় পরিবেশ আর রন্ধনশৈলী যুগপৎভাবে ব্যঞ্জনাময় অনুভবের সৃষ্টি করে। বকুলবালার সেই রন্ধনপটুতার বর্ণনা দাদাভাই দেয় এভাবে :

> একদিন ভোর থেকে ঝমঝমে বৃষ্টি, ঘর ছেড়ে যে বেরুবো তার কোনো জো নেই। উঠোনে একহাঁটু পানি। . . . খুদ দিয়ে কী একটা রাঁধলো, খিচুড়ির মতো দেখতে, পোলাও-এর মতো খেতে, বললে গরম গরম খাও, ভালো লাগবে। খাওয়ার সময় খানিকটা কাঁচা ঘি দিয়ে দিলে তাতে। . . . উঠোনের কোণে ছিল কয়েকটা বেগুনগাছ, তাতে পোকা ধরেছিল; ভেমরো মতো একটা বেগুন ঝুলছিল কোনো একটার ডালে, ছিঁড়ে এনেছিল সেটাও, তার ভর্তা! আরে-ব্বাপ! কোথায় লাগে মাছগোশ। গালে স্বাদ লেগে আছে এখনো।[৪৬]

খুব সামান্য বিষয় লেখকের শিল্পনৈপুণ্যে এমন অসামান্য ব্যঞ্জনায় দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। গদ্যে অলংকারের প্রয়োগও নান্দনিকতায় উদ্ভাসিত। কয়েকটি নমুনা :

অনুপ্রাস :

> ... রাজাকার–ফাজাকার মিলিশিয়া–ফিলিশিয়া ব্যাক ফিনিশ ![৪৭]

বক্রোক্তি :

> ততক্ষণে ডান কাঁধের একটা পাশে যা গাঁথার তা গেঁথে গেছে।[৪৮]

উপমা :

> মাঝে মাঝে কেবল খসা পালকের মতো কিছু গুজব রটে আর সেই গুজবটুকুকেই মূলধন করে অমূলক খুশির তুফান ছোটে।[৪৯]

উৎপ্রেক্ষা :

> ফুলে ফুলে ঘাস ঢেকে থাকে, মনে হয় কেউ যেন ফুলের চাদর বিছিয়ে রেখে গেছে।[৫০]
>
> বৃষ্টি নয় যেন তাণ্ডবলীলা। বিলের ওপর ঝমঝমে আঁধার, সেখানে আকাশ ভেঙে পড়েছে।[৫১]

সমাসোক্তি :

> বুনো বাতাস এক একবার গাছপালার ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়, কখনো-বা ছোবল মারে।[৫২]

ব্যাজস্তুতি :

> ... গুণের মধ্যে তোমার ওই একটাই—পেট বোঝাই ঝাল![৫৩]

বাক্যে বাগ্‌ধারা ও প্রবাদের ব্যবহার :

> গ্রামের দু'মুখো সাপের মতো মানুষের কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে মুকুল।[৫৪]
> ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাচ্ছে সকলে ; মন জোগানো কথার তুবড়ি ছুটলেও, তার ভেতরে ঢ্যাবঢেবে ফাঁকা আওয়াজ।[৫৫]

বাক্যে লোকবিশ্বাসের প্রকাশ :

> যাতে বিয়ে না হয় সেজন্য হাজার গণ্ডা ব্যাঙ মেরেছি, . . . ।[৫৬]

স্টিমারের বাঁশির শব্দে ধ্বনিদ্যোতনা সৃষ্টি হয় এভাবে :

> ঠিক তক্ষুণি হুপ হু-উউউউউ-প করে একটা বাঁশি বেজে উঠলো।[৫৭]

চিত্রকল্প :

> বৃষ্টি নয় যেন তাণ্ডবলীলা, বিলের ওপর ঝমঝমে আঁধার, সেখানে আকাশ ভেঙে পড়েছে। উঠোনের ছপছপে পানিতে বলের মতো ভেসে বেড়ায় শুকনো কদম; বুনো বাতাস এক একবার গাছপালার ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়, কখনোবা ছোবল মারে।[৫৮]

এভাবে কাব্যিক ব্যঞ্জনাময়তার সাথে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা একাকার হয়ে লেখকের শিল্পবোধের স্বকীয় প্রকাশ ঘটে *খেলাঘর* উপন্যাসের ভাষায়। মাহমুদুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেন 'শেষের দিকের লেখাগুলোতে আমি একঘেয়েমিতে ভুগছিলাম—নতুন প্রকাশভঙ্গি বা ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'[৫৯] এখানে শেষের দিকের লেখা বলতে *মাটির জাহাজ* এবং *খেলাঘর* উপন্যাসকে বুঝিয়েছেন। আমরা এই দুটো উপন্যাসের ভাষারীতি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই আছে। লেখকের একঘেয়েমির প্রকাশ তেমন একটা চোখে পড়ে না। বরং এই উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের মতো একটা বিষয়ের পাশাপাশি গ্রামীণ নিবিড় নিস্তরঙ্গ এবং স্নিগ্ধ কোলাহলমুক্ত একটা জীবনকে তার ভিন্নধর্মী আবেগসহ প্রকাশভঙ্গিতে আলাদাভাবে উপস্থাপনে বেশ দক্ষতার প্রকাশ ঘটে। রেহানার সংলাপে যে সাবলীলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, জীবনের যে সাড়ম্বর উপস্থিতি তা বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। এই উপন্যাসটি অনেক সমালোচকের কাছেই বেশ সুখপাঠ্য এবং প্রিয় অভিধা পায়—শুধু এর মন ছুঁয়ে যাওয়া গদ্যভাষার জন্য। তবে এই উপন্যাসের দুএকটা চরিত্র, নৌকা ভ্রমণ, মাঝির প্রসঙ্গ—এসব আগের উপন্যাসগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়। আর ইয়াকুব চরিত্রের মনোগঠনে খোকা চরিত্রের ছায়াও পরিলক্ষিত হয়। তবে রেহানা বা আন্না বা ঝুমি স্বতন্ত্র এবং একক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

এই উপন্যাসে মাহমুদুল হক:

> ইয়াকুব ও রেহানার দুদিনের খেলাঘর রচনা করেছেন। প্রায় অবিশ্বাস্য বাস্তবতা দিয়ে, নিয়তি-কঠিন সারল্যে, মুক্তিযুদ্ধের বাইরে ক্ষণিকের শান্তিদ্বীপে ঢাকার আঞ্চলিক জাদুকরী সরল ভাষার কথোপকথন দিয়ে। প্রকৃতির গভীর গভীর বাড়ির ভেতরে সকল আয়োজন

> ও আবহ শেষ পর্যন্ত আমাদের মায়াজালের বন্দিশিবিরে আচ্ছন্ন করে রাখে। যুদ্ধের ভেতরে যুদ্ধবিরোধী চেতনায় আন্দোলিত অথচ সুস্থির চরিত্র আন্না।[৬০]

আর এই যুদ্ধবিরোধী চেতনার মধ্যেই লেখকের জীবনদর্শনও নিহিত থাকে। উপন্যাসের শেষে বা আখ্যানে তেমন কোনো রহস্যময়তা নেই। উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত হলেও এখানে ঘটনার চেয়ে ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশেই লেখকের মনোযোগ নিহিত। মুক্তিযুদ্ধকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয় এখানে। যা শুধু লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ বা শিল্প ভাবনার সফল প্রয়াস নয় তার পাশাপাশি ইতিহাসকে সাহিত্যে তুলে ধরার এই প্রকরণশৈলী সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্নধর্মী মর্যাদার দাবি রাখতে পারে অনায়াসেই।

পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী মাহমুদুল দক্ষ জহুরির মতো নিখুঁতভাবে গড়ে তোলেন তাঁর উপন্যাসের কাঠামোকে। আর তাঁর গভীর জীবনবোধ, ব্যক্তি, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতিকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিশিষ্ট বাগবৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে বাস্তবের পুনর্নির্মাণ হয় উপন্যাসে অসাধারণভাবে। তাঁর লেখা নিয়ে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য :

> মাহমুদুল হক তাঁর আখ্যানভাগের মাধ্যমে পাঠককে আমন্ত্রণ জানান তাঁর পাত্রপাত্রীর অভিজ্ঞতার চেয়েও গভীরতর কোনো অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করতে। তাঁর মানব-মানবীরা আমাদের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সঞ্চারিত করে যা অংশত শারীরিক এবং অধিকাংশটুকু উপলব্ধির সারাৎসার, যেখানে নিজের দিকে চেয়ে তাকানোর ফুরসত মেলে। শুধু তাই নয়—সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে শব্দ ও সঙ্গীতের এমন একটি অনুরণন সর্বদাই উপভোগ করা যায় যেখানে বিটোফেনের সিম্ফনিগুলোর মতো সকল অনৈক্যের মুখ ফেরানো থাকে ঐক্য ও সংহতির দিকে। মাহমুদুল হকের আখ্যান-পরিকল্পনায় এই ঐক্য ও সংহতি এবং সমগ্রতার আস্বাদ বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন এক পরিপ্রেক্ষিতের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। এবং সেই জগৎ আমাদের চিরপরিচিত হয়েও অচেনা এক রহস্যজালে, অব্যাখ্যাত এক মমত্ববোধে এবং মধুর এক নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণার সীমা-পরিসীমায় আমাদের পৌঁছে দেয়।[৬১]

সমালোচকের এই বিশ্লেষণের সাথে আমরাও এক মত। মাহমুদুল হক যেখানে তাঁর লেখা শেষ করেন সেখান থেকে পাঠকের আরেক নতুন ভুবনে যাত্রা শুরু হয়। কারণ তাঁর আখ্যান রহস্যময়তাকে ধারণ করে এবং চরিত্রের মনের গহিনে আলো ফেলে এক দুর্জ্ঞেয় জগতের উন্মোচন করে। তাই পাঠকের বোধের জায়গাটাতে অনুরণন তোলে স্বাভাবিকভাবেই। তাঁর শিল্পজগতে প্রস্তুতি নিয়েই প্রবেশ করতে হয় পাঠককে কেননা মনোযোগ শতভাগ না থাকলে তিনি কী বলেন আর কীভাবে বলেন এই দুটো দিককে একসাথে ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। আর একসাথে ধারণ করতে না পারলে রসভঙ্গ ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মাহমুদুল হকের আপাত বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বিষণ্ন এবং স্মৃতিকাতর চরিত্রগুলোর সাথে পাঠকও কোনো-না-কোনোভাবে জড়িয়ে পড়ে। আর তখন তৈরি হয়ে যায় লেখার সাথে পাঠকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর মাহমুদুল হক এই সম্পর্ক তৈরির কৌশলটা খুব ভালোভাবেই জানেন। তাঁর অসাধারণ গদ্যশৈলী আর গভীর, সূক্ষ্ম জীবন ও সমাজবীক্ষণ এই সম্পর্ক তৈরির মৌল সূত্র।

তথ্যসূচিঃ

---

১ হোসনে আরা কামালী, "মাহমুদুল হকের উপন্যাস : জীবনোপলব্ধির সত্য উদ্‌ঘাটন" (এম.এ. থিসিস, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬) পৃ. ৬

২ মাহমুদুল হক, "যে ভাষা নিয়ে আমরা খেলছি আজ তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি রক্তস্নাত রাষ্ট্র", লতিফ সিদ্দিকী গৃহীত সাক্ষাৎকার, লতিফ সিদ্দিকী সম্পা., *রোদ্দুর*, ১ম সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৯২), সংকলিত, আহমাদ মোস্তফা কামাল সম্পা., *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হক স্মরণে* (ঢাকা : শুদ্ধস্বর, ২০১৩), পৃ. ৮

৩ মাহমুদুল হক, *খেলাঘর* (২য় মু.; ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ২২

৪ *তদেব*, পৃ. ৪০-৪১

৫ *তদেব*, পৃ. ৪১

৬ *তদেব*, পৃ. ৪৮

৭ *তদেব*, পৃ. ৫৩-৫৪

৮ *তদেব*, পৃ. ৬৭

৯ *তদেব*, পৃ. ৭১

১০ *তদেব*, পৃ. ৭৪-৭৫

১১ *তদেব*, পৃ. ৭৬

১২ *তদেব*, পৃ. ৮০

১৩ মাহমুদ আল জামান, "কথাশিল্পী মাহমুদুল হক", আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পা., *আলোছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১২১

১৪ মাহমুদুল হক, *খেলাঘর*, পৃ. ৬৭

১৫ *তদেব*, পৃ. ৫৫

১৬ *তদেব*, পৃ. ৬০

১৭ মাহমুদুল হক, "শিল্পীদের লোভ থাকতে নেই", আহমাদ মোস্তফা কামাল গৃহীত সাক্ষাৎকার, শামীমুল হক শামীম সম্পা., *লোক*, ৯ম বর্ষ সংখ্যা ১১ (নভেম্বর ২০০৭), সংকলিত, *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হকের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, পৃ. ৩৭

১৮ ঐ, *খেলাঘর*, পৃ. ৫৪-৫৫

১৯ *তদেব*, পৃ. ৭৬

২০ *তদেব*, পৃ. ৭৯

২১ *তদেব*, পৃ. ৪১-৪২

২২ *তদেব*, পৃ. ৩৯

২৩ *তদেব*, পৃ. ৪০

২৪ *তদেব*, পৃ. ৩২

২৫ *তদেব*, পৃ. ৭৩

২৬ *তদেব*, পৃ. ৭৬

২৭ *তদেব*, পৃ. ৮০

২৮ *তদেব*, পৃ. ২৮

২৯ *তদেব*, পৃ. ২৭

৩০ *তদেব*, পৃ. ২৯

৩১ মাহমুদুল হক, "হেলাফেলায় বহু কিছুই করা যায়, সাহিত্যচর্চা হয় না," প্রভাত দত্ত গৃহীত সাক্ষাৎকার,

মাহমুদুল হক স্মারকগ্রন্থ, (জুন ২০০৯), সংকলিত, *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হকের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, পৃ. ২২

৩২ ঐ, *খেলাঘর*, পৃ. ১৬-১৭

৩৩ *তদেব*, পৃ. ৩৫

৩৪ *তদেব*, পৃ. ৬২-৬৩

৩৫ *তদেব*, পৃ. ৬৩-৬৪

৩৬ মাহমুদুল হক, "শিল্পীদের লোভ থাকতে নেই", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৩৭ ঐ, *খেলাঘর*, পৃ. ২২

৩৮ ঐ, "শিল্পীদের লোভ থাকতে নেই", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৩৯ ঐ, *খেলাঘর*, পৃ. ৪৪

৪০ *তদেব*, পৃ. ৬৭

৪১ *তদেব*, পৃ. ৬৭

৪২ *তদেব*, পৃ. ৩৯

৪৩ *তদেব*, পৃ. ৭৩

৪৪ *তদেব*, পৃ. ৪০

৪৫ *তদেব*, পৃ. ৬৪

৪৬ *তদেব*, পৃ. ২৭-২৮

৪৭ *তদেব*, পৃ. ৭২

৪৮ *তদেব*, পৃ. ১৯

৪৯ *তদেব*, পৃ. ৩৪

৫০ *তদেব*, পৃ. ৫১

৫১ *তদেব*, পৃ. ৬৯

৫২ *তদেব*, পৃ. ৭০

৫৩ *তদেব*, পৃ. ৬৯

৫৪ *তদেব*, পৃ. ৪২

৫৫ *তদেব*, পৃ. ৪২

৫৬ *তদেব*, পৃ. ২১

৫৭ *তদেব*, পৃ. ৪৬

৫৮ *তদেব*, পৃ. ৬৯-৭০

৫৯ মাহমুদুল হক, "শিল্পীদের লোভ থাকতে নেই", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৬০ বিপ্রদাশ বড়ুয়া, "খেলাঘর আন্না প্রকৃতি মাহমুদুল হক", *আলোছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে*, পৃ. ১১৫

৬১ সরকার আবদুল মান্নান, "মাহমুদুল হকের উপন্যাস : আখ্যান-ভাবনা", পৃ. ১৮৮